International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-II, September 2015, Page No. 16-25
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ছোটোগল্পের নাট্যরূপ (নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে)

ড. দীপন দাস
এস.সি.বি.সি. কলেজ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The overarching gamut of short stories has been enriching the vast terrain of Bengali literature in the Modern Times. It is equally enriching the taste bud of millions. The negotiations of the known/unknown characters/characteristics live illuminated and highlighted the limits of various realities. If we look into the modalities of short story we not only come across the dram of life in it but could also trace the dramatic essence which is inevitable in drama per se. It is in this context that this paper foregrounds the dramatic quality within short stories highlighting stories of yester years in Bengali literature.

"মনে হল প্রথম প্রেমের পর আরও প্রেম আসে, কিন্তু প্রথম মৃত্যুর পর আর মৃত্যু নেই"- গল্পকারই একথা ব্যবহার করেছেন ছোটগল্পে। জীবন নাট্যের এই রঙ্গভূমিতে একলা চলার অনুসঙ্গেই ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখকে নিয়ে বিশ্বজীবনের পথে মানুষ। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রাক মুহূর্তে এই চিত্রন ছোটগল্পে। ছোটগল্প তাই আমাদের কাছে খন্ড মুহূর্তের হীরক দ্যুতির উজ্জ্বল্যতা নিয়ে আসে। দেশ কাল পাত্রভেদে আজ যা ঘটে চলেছে সেই সূত্রতাকেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করে অন্তরের অতৃপ্ত ক্ষুরধার রহস্যময়তার সন্ধান দেয়। সমাজ-জীবন কেন্দ্রিক পাত্র-পাত্রীর এই সকল কথাকে লেখকরা মানব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মোহরকুঞ্জের মত নতুন হয়েছে ছোটগল্পে।

তবে ছোট গল্প নিয়ে পাঠক মহলে মতামতের রকমফের অনেক। ছোটগল্প কি এ নিয়েও বিশ্লেষণ কম নেই। কিন্তু বিস্ময় জাগে চল্লিশের দশক কিংবা পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী সময়ে লেখকদের গল্পরচনার বৈচিত্র্যতায়। যদিও রবীন্দ্রনাথেই সার্থকতার সূত্রপাত। কিন্তু তৎপরবর্তী সময়ে ছোটগল্পের সংজ্ঞাটাই বদলে গেছে। জীবন মৃত্যুর প্রতি পদে পদে তিল তিল মৃত্যুকে দেখার বিশ্লেষণী তত্ত্বেই ছোটগল্পের সংজ্ঞা পেয়েছি। ছোটগল্প তাই মানব প্রবৃত্তির নিঃসন্দিহান ছবি; অচেনা মানুষকে সূক্ষতার আলোকে দেখার অন্য এক অভিজ্ঞতা। ইতিহাসের অচেনা ছবি যেমন চেনা রাস্তায় গল্পের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসে তেমনি।

ছোটগল্পের এই রূপ ধ্যানধারণা থেকেই অপর একটি সূক্ষতর দিকের চকিত চমকের মধ্যে দিয়ে নাটকের সাথে সামঞ্জস্য সূত্রতা খুঁজে পাওয়া যায়। নাটক ও ছোটগল্পের এই যে মেলবন্ধন তা শুধুমাত্র ভাব সূত্রতায় একদিক থেকে নয় বিভিন্ন দিক থেকে —

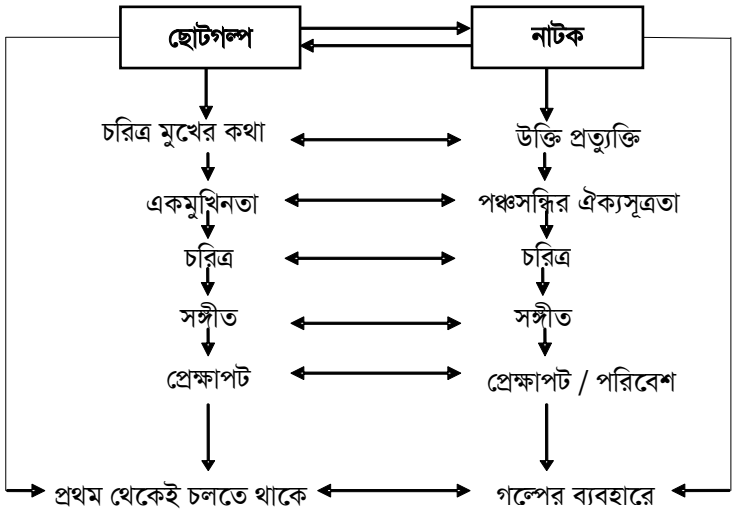

এছাড়াও নাট্যভাবনায় যে সূত্রগুলি কাজ করে তা হল – নাট্য ক্রিয়া, নাট্যগতি, নাট্যবিষয় বা climax এবং পরিণতি। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা অভাবনীয় নয়। গল্পের মধ্যে নাট্য অস্তিত্ব এবং গল্পই যখন নাটক হয়ে উঠেছে তখন এই ভাবনার মেলবন্ধন হয়েছে স্বাভাবিক। এমনকি গল্প পরিণতিতেও হয়েছে নাট্যগুনান্বিত। ছোটগল্পের নাট্যগুণ কিভাবে এসেছে সেই বিষয়টি নির্বাচিত ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়। যথা—

(ক) 'মুসলমানীর গল্প' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) 'যতন বিবি' – অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গল্প দুটিতে রয়েছে উক্তি প্রত্যুক্তি, নাটকীয় গতিময়তা, ব্যঞ্জনাময়তায় যা পরিবেশের সঙ্গে অন্বিত। এছাড়াও কেন্দ্রীয় চরিত্রানুযায়ী নামকরণের দিকটি বিশেষভাবে আকর্ষনীয়। দ্বিতীয় পর্বে আরো দুটি গল্পকে আমরা যদি বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিচার করি তবে লক্ষ্য করা যায়—

(ক) 'বারিক অপেরা পার্টি' এবং
(খ) 'ইমারত' গল্পে

সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে গল্পের সূচনা, এখানে জীবন যেন নাট্য ক্রিয়া। পরিণতিতে এসেছে নাট্যগতি এবং সবশেষে ব্যঞ্জনা, নাটকীয়তায় ভরা প্রতিটি চরিত্র। 'ছোটগল্পের এই সকল বৈশিষ্ট্য আরো ব্যপকতর হয়েছে তৃতীয় পর্বে আলোচিত গল্প দুটিতে—

(ক) 'একপো দুধ' এবং
(খ) 'সাদা ঘোড়া'

গল্পে। এখানে প্রধান চরিত্র এবং ব্যঞ্জনাময়তায় নিম্নমধ্যবিত্তের পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং চরম climax যেন মানবেতর প্রাণকে পরিণতি বোধে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। গল্পের পরিণতিও ব্যঞ্জময়তায় সফল হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'মুসলমানীর গল্প' খসড়াটি লিখেছেন ১৯৪১-এ। সূচনাতেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সামাজিক অভিঘাত রাষ্ট্রীক বিপর্যয়তার কথা। রাষ্ট্র শাসনের প্রবল অরাজকতার মধ্যে হিন্দু নারীর মুসলমানীতে পরিণত হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে সে কথাই প্রমাণ করে। তবে রবীন্দ্রনাথের এই গল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ও গ্রহণীয়তা নিয়ে একালে অনেকের মধ্যেই জিজ্ঞাসা ও কৌতুহল আছে। সফলতার এই প্রশ্নের উত্তরেও তাঁদের অভিমত 'সমস্যাপূরণ' 'দালিয়া', 'দুরাশা'-র মত গল্পের দিকে। তাঁদের উদ্দেশ্যেই বলা গল্পটি খসড়া হলেও কালের অভিঘাত থেকে একেবারে মুক্ত করা যাবে না। গল্পে একান্নবর্তী

পরিবারের পিতা-মাতাহীন কমলার পরিণতি একালের যে কোন কমলার মতোই। ডাকাত ও দস্যু দলের কথা নয়, ইভটিজার রূপে এই সময় সমাজে যাদের দেখা যায় তাদের সঙ্গেই তুলনীয়। কারণ গল্পে কমলার পরিণতি স্বজাতীয় সমাজ থেকে চ্যুত হওয়া। তবে সূত্রাকারে বিষয়টি সাজালে দেখা যায় —

> নবজীবনের সূচনা → ডাকাত দল কর্তৃক আক্রান্ত → হবির খাঁর সাবধানী বাণী → কমলার কাকার গৃহে আশ্রয় হারানো → হবির খাঁ এর কাছে আশ্রয় লাভ। গল্পের এই পরিণতির কথা একালেও একই ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আবার 'যতনবিবি'তে যে সমাজের কথা পাওয়া যায় তা যুগান্তকারী ঘটনাই শুধু নয়, অন্যভাবেও বলা চলে এযেন হৃদয়ের একমাত্র সাধনার ধন। কিন্তু তাতে অধিকার বোধ এতটুকুও নেই। শিল্পীর হাতে যে প্রতিমা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তা শেষপর্যন্ত শিল্পীর কাছ থেকে চলে যায় 'যতন বিধি' ও তাই।

'মুসলমানীর গল্প' সূচনাতে রয়েছে পশ্চাদগতি অনুধাবনের এর মাধ্যমে পূর্ব ঘটনাকে জানিয়ে দেওয়া এবং 'যতন বিবি'তে রয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সরাসরি বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথ ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দুই গল্পকারই পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দুই গল্পকারই পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন একটু বিস্তৃতভাবে। মুসলমানীর গল্পে আর্থসামাজিক পরিস্থিতির দৈন্যরূপ আর যতনবিবির-হানিফের দৈন্যরূপের মধ্যে একটা ঐক্যসুর রয়েছে। তিনমহলার তালুকদার বংশীবদনের গৃহের সমস্যাটা ছিল কমলার বিবাহকে কেন্দ্র করে। কাকা-কাকীমা দোজবর ভোজপুরী এক পালোয়ানের সাথে কমলার বিবাহ স্থির করে। কিন্তু মধুমোল্লার হাতে পড়ে ব্রাহ্মণকন্যা কমলা শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায় বৃদ্ধ হবির খাঁ এর হুঙ্কারে। কমলা দ্বিতীয়বার ফিরে আসে গৃহে। কিন্তু সমাজ প্রচলিত নিয়মানুসারে শেষ পর্যন্ত স্থান পায়নি। ভালোবাসার অতলস্পর্শে জাতধর্মের জলাঞ্জলী দিয়ে মেহেরজানে-সে পরিণত হয়েছে।

'যতনবিবি'তে প্রাথমিক পর্বে যতনের রূপঐশ্বর্য কিছুই ছিল না। অভুক্ত খেতে না পাওয়া হাড় লিকলিকে চেহারার মেয়েটি এসেছিল একমুঠো ভাত অথবা ফ্যানের ভিক্ষা করতে। যতনই হানিফের চুরি করা ভাত, কপড়, তেল সাবানের অনুদানে ফিরে পেয়েছে যৌবনের ছটা। এই গৌরবই তার স্বাধীকারবোধ ও আত্মগৌরবের বিষয়। অথচ হানিফ প্রকৃত কারিগর হলেও প্রতিমার প্রকৃত অধিকারী হতে পারে নি।

নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হল সংলাপের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে। সেক্ষেত্রে সব ছোট গল্পে এই বৈশিষ্ট্য থাকবে সেটাও বলা যায় না। তবে অনেক গল্পেই এই বৈচিত্রতা দেখা যায়। 'মুসলমানীর গল্প'-তে কথক-বেশ কিছু ক্ষেত্রে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলা, ডাকাতদল, বৃদ্ধ হবির খাঁ এই ত্রয়ী বন্ধনই নাট্যগতি ও গল্পের ঘটনাকে সুদূর প্রসারী করেছে। এছাড়াও গল্প সূচনায় বংশী বদন, কমলার কাকীমার কণ্ঠে শোনা গেছে climax এর চূড়ান্ত সুর — "পোড়ামুখী বিদায় হলেই বাঁচি" অথবা" অথবা যখন বলেন —

> "দূর করে দাও, দূর করে দাও অলক্ষীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই।"

কমলার কাকার কণ্ঠেও শোনা গেছে —

> "আমাদের যে হিন্দুর ঘর, ... মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।"

বৃদ্ধ হবির খাঁ জীবনের অভিজ্ঞতায় সত্য জেনেছে। তাই অপেক্ষা করেছে কমলার জন্য। মুসলিম হয়েও সমাজ বিতাড়িত হিন্দু মেয়েদের প্রকৃত আশ্রয় দাতা তিনি। জীবনভর তার এই ব্রত। হৃদয়ের বন্ধনের কাছে কমলা তাই বরণ করে নিয়েছে মেহেরজান নাম।

'যতনবিবি' গল্পেও সংলাপের এই নক্শা আরো বেশি জোরালো হয়েছে। হানিফ, সাহেব, যতন বিবি এবং কুদ্দুসকে নিয়ে এই গল্প। হানিফ কঠোর পরিশ্রমী তার কথাই গল্পে বেশি। মফঃস্বলের সাহেবকে জলের পোকা হানিফ প্রাণে বাঁচিয়ে বাবুর্চির আসন দখল করে নিয়েছে। সাহেবের সঙ্গে হানিফের সহজ সরল সখ্যতার ভাবটি তাই নাট্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী। সাহেব বলেন— 'কি রে, হল?' (নামাজ শেষ করে হাফ প্যান্টে বেল্ট আঁটতে আঁটতে সাহেব জিজ্ঞেস করে।) এমনই উক্তি প্রত্যুক্তিতে সংলাপের বৈচিত্র পরবর্তী স্তরেও এসেছে কথোপকথনের ভঙ্গীতে। যেমন—

"তুই যে দিনে দিনে কাহিল হয়ে যাচ্ছিস"
"হজম হচ্ছে না, হুজুর।"
"তোর যে দেখছি ভীষণ বাবুয়ানা। লোকে খেতে পায় না আর তুই পাচ্ছিস না হজম করতে।"
"এখানকার জল হুজুর, বোদা, পানসে।"
"আর তোর হাতিয়ার জল তো লোনা।"
"হানিফের চোখ চকচক করে ওঠে। বলে, 'সমুদ্রের সোয়াদ।'"

নাটকের সাথে ছোটগল্পের অপর একটি মিল ঐক্যসূত্রতায়। গতিময়তার সাথে এই মিল লক্ষ্য করা যায়। 'মুসলমানীর গল্প' এবং 'যতনবিবি' উভয় গল্পে কিন্তু এই গতিময়তার সূত্রটি প্রথম থেকেই কাজ করেছে। সূচনা থেকে লেখকের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি ছিল। তবে ছোটগল্পের রৈখিক বৃত্তান্তের অন্তরালে অন্য কয়েকটি বিষয় ভাবসত্যতার কাজ করেছে —

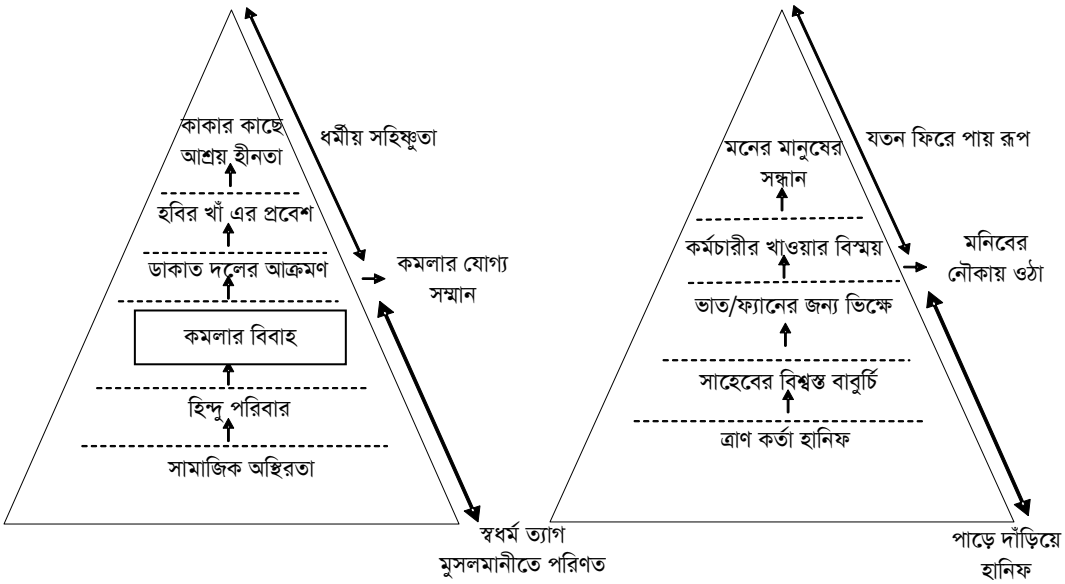

অর্থাৎ যতনবিবিতে ক্রমউচ্চ একটা পরিণতিই কার্যকরী গতিময়তাকে নিম্নতল থেকে উর্দ্ধমুখী করেছে। প্রথমে তার জৈবিক নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার ভাব থাকলেও নতুনকে জানার চাহিদা ছিল এবং পেতে চেয়েছে সম্মান ও ক্ষমতা। তাই আত্মরক্ষার চাহিদা থেকে আত্ম-বিকাশের চাহিদাই যতনবিবির মধ্যে এসেছে।

মুসলমানী গল্পের গতিময়তা ত্বরান্বিত হয়েছে পরিবারতন্ত্রকে ছাপিয়ে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কাছে। হিন্দু পরিবারের মেয়ের বিবাহকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য নীতিতে পরিণত গল্পের গতিময়তা। সুতরাং, উভয় গল্পেই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে নাট্য ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

গল্পনামের ব্যঞ্জনাতেও নাট্যভাবের দ্বান্দ্বিকতার সুর স্পষ্ট। বিশেষত নাটক যখন জীবনবেদ্য, তেমনি আমাদের ক্রমিক রিলিফ দিলেও ছোটগল্প পাঠের শেষে দীর্ঘকালীন একটা রেশ থেকে যায়। এই বিষয়টি নাট্যদ্বন্দ্বের সঙ্গে মিলে যায়। এক্ষেত্রে 'মুসলমানী গল্পে' মেহের জান (কমলা) হবির খাঁ এর অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকা নিয়ে কাকার মেয়ে সরলাকে রক্ষা করে এবং বলে—

"আমার বোন যদি কখনো দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে তাকে রক্ষা করবার জন্য।"

কমলার এই উক্তি নিষ্ঠুর নির্মম সমাজ ব্যবস্থার প্রতি চপেটাঘাত। সুতরাং পরিণতিতে নাট্য ভাবনার উপস্থিতি বর্তমান।

আবার হানিফ হাতেগড়া যতনবিবিকে একান্ত আপন করে পেতে চেয়েছে। কিন্তু দুনিয়াদারির হালহকিকত যতনের অজানা নয়। তাই হানিফ নয় অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল মালিককেই সে বেছে নেয়। নিজের হাতে গড়া মূর্তির ছাঁচ বদলাতে দেখে দিশেহারা হানিফ। সুতরাং গল্প পরিণতিতে ব্যঞ্জনাময়তা রয়েছে বলতে পারি।

আরো একটি বিষয় পরিবেশগত ভাবসাদৃশ্যে। মুসলমানী গল্পের প্রাকৃতিক পরিবেশ ডাকাতদলের গোপনীয়তার কথাকে ভয়াল করে তোলে। তেমনি 'যতনবিবি' গল্পের প্রকৃতি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বিতীয় নায়ক। সমুদ্রের বিস্তৃতিতে, হানিফের আত্ম গোপনীয়ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মেঘনা নদীর ভয়াবহরূপ, ৪৪-এর দুর্ভিক্ষ, আচমকা মেঘের ঘূর্ণীপাঁকে জীবন সমুদ্রে উত্তরণ নিঃসন্দেহে সে কথার প্রমাণ দেয়। সুতরাং সূচনায় মেঘনা নদী আর সমাপ্তীতে নদীবক্ষে যতনবিবির সাহেবের নৌকায় ওঠা ঘটনার যোগসূত্রকেই ইঙ্গিতায়িত করেছে।

চরিত্রানুযায়ীও দুই গল্পের মধ্যে একটা মিল আছে - যতনবিবি এবং মুসলমানীর কমলা - দুজনই নারী। একদিকে বিদ্রোহিনী অপর দিকে ক্ষুধার্ত, ছিন্ন-জীর্ণ মলিনতার পরিপূর্ণতা নিয়ে যতনবিবি সাহেবের নৌকায় আস্থা-ভরসা খুঁজে পেতে চেয়েছে। আর কমলা মুসলমানী হয়ে আপন গৌরব ও অধিকার খুঁজে পেয়েছে।

'বারিক অপেরা পার্টি' এবং 'ইমারত' গল্পের ভাব স্বাতন্ত্রতা অন্য অনুভূতি এনে দেয়। তবে ছোট গল্পে গানের ব্যবহার ক্ষেত্র বিশেষে দেখা গেলেও নাটকে গানের মধ্যে দিয়ে নাট্যঘটনার সূচনা তথা প্রকাশ ছোটগল্পের তুলনায় একটু বেশি। নাট্য বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষ মাধ্যম হল গান। সাঙ্গীতিক মাধ্যমে নাট্যকার নাট্যঘটনার বিষয় সমূহকে পাঠক সমক্ষে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে 'বারিক অপেরাপার্টি' এবং 'ইমারত' দুই গল্পেই গানের ব্যবহার রয়েছে যা ঘটনা পরিস্ফুটনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

'বারিক অপেরাপার্টি'-তে বারিকের তদারকিতে বেশ কিছু গান ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— 'ওগো হরি বংশীধারী শ্যাম লটবর' অথবা ছোট ছেলে কৃষ্ণ সাজে যখন গেয়ে ওঠে —

"ওরেও কিছান ভাই,
আমি হেথা বলে যাই
গওরেতে শোন সেই বাণী।"

কিন্তু বারিকের কণ্ঠে —

"ধনি, কি সুখে রাখবি পরান,
কানু হেন গুননিথি গ্রেহে না আইল যদি
অঝোরে বহিল দু'লয়ান-"

শুধুমাত্র গানের মহলা দিতেই, একাকী অন্ধকারে পথে সে গাইতে থাকে—

"তুমি কোন অংশে বল কোন বংশে
কারে - এত করেচ সুখী
নামটি তোমার দয়াময়
কথায় বটে কাজে নয়"

এ গান তো শুধু গান নয়, ভিটেমাটি উৎখাত, অনাহার অর্দ্ধাহার, অভুক্ততা যাকে পরাজিত করতে পারেনি সেই বারিকের কণ্ঠে উচ্চারিত। পুত্রহারা পিতা, শোকে স্তব্ধ নয় বরং শৈল্পীক প্রতিভার স্ফুরনই তার মধ্যে। পুত্রের শেষ সমাধীস্থলে কাফনের কাপড় না জুটলেও গান তার কণ্ঠছাড়া হয়নি।

'ইমারত' গল্পেও এমনই একটি গান শোনা গেছে মতির কণ্ঠে —

"বাবুদের চি-লে কো-ঠার ছাদে
চিল কাঁদিছে গো ভরা দুপুরে -
চিলি পালায়ে কোথা বাসা
বেঁধেছে কোন তালপুকুরে।"

পুরানো এই গানটি একসময় রেজারাদের কণ্ঠে প্রচলিত ছিল। ইমারত গল্পে এই গান কর্মসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। কাজের ফাঁকে তালে তালে এই গান যেন পুরনো ছন্দে নতুনত্বের সৃষ্টি। জনাব শেখ সেই পরিচিত সুরের তালেই মন্দির তৈরীর কাজে মগ্ন, তার কাছে গান যেন প্রাণের সুখ!

'বারিক অপেরাপার্টি' এবং 'ইমারত' গল্পের বারিক মন্ডল ও জনাব শেখ কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্বয়ের উত্থান-পতন তাঁদের জীবন জুড়ে। বারিক আর জনাব দুজনই প্রকৃতির সাথে আত্মকথনের ভাবনাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। জীবনের পড়ন্ত বেলাতে উপনীত এরা, উপলব্ধির বিস্ময়কর স্নিগ্ধতার কাছে পরিপূর্ণ তারা। তাদের জীবনের হাহাকারের নিঃসীম শূণ্যতা প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে গেছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রাক্-মুহূর্তে বারিক মন্ডল কথকের কাছে ধানী জমি বিক্রি করতে আসে, তাও নিজের নয়। অন্যের হয়ে উপযাচকের মতো। এই সুবাদে নিজের ট্যাকের পয়সা খরচ করে জমি বন্দ্যোবস্ত হওয়ার দরুন সকলকে সে খাওয়ায়। পেশায় কৃষক হলেও নেশা তার গান গাওয়াতে। ছন্নছাড়া অবস্থা তার, হাল বলদ ক্রোক হওয়ার মুহূর্তে সে নতুন জমিদারের কাছে প্রজাস্বত্ব গ্রহণ করে। গৃহপরিবারের হতশ্রী রূপের প্রতি তার চোখ পড়ে না। দু-দুটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও বারিক তাদেরকে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিয়েছে। কাজ কর্ম কিছুই শেখায়নি। ঋণের কারণেই হাল বলদ ক্রোক করে নিয়েছে। আহিম্মদ দফাদারও হাটের মাঝে গলায় গামছা দিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। কারণ পূর্ব প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করেনি। তাই আহম্মদ দফাদার ছিনিয়ে নিয়েছে দুকাঠা মুসুরী, দুটো মানকচু। এরই মধ্যে বারিক মন্ডলের বড় ছেলেটি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। কিন্তু বারিকের পালাগান থামেনি আশ্চর্য জীবনী শক্তি নিয়ে বিদূষকের ভূমিকায় লোক হাসিয়ে গাইতে থাকে।

'ইমারত' গল্পের জনাব শেখও এমনই ট্রাজিক হিরো। বছর ষোলোর জনাবের চোখে ছিল রঙিন স্বপ্ন। বিস্ময় জাগানো কারিগরের চোখ আটকে গিয়েছিল রাজনগরের প্রাচীন সৌধস্তম্ভ দেখে। ঘরে ফিরেও তার সেই ঘোর কাটেনি। কলকাতার মনুমেন্টের গল্প, হাজার দুয়ারীর প্রশংসিত কথাও তার মুখে। এই নেশাতেই রঙ্গুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে সাহেব ডাঙ্গায়। কিন্তু কাজ শেখার প্রতিদান স্বরূপ হস্তান্তরিত করেছে গুরুর কাছে। এভাবেই রঙ্গু, সৌরভী, হায়তন, রোশনী, টগরীবউ, সত্যঠাকুরঝি, জুবেদা, রাণী সই, মতি নাতবউ, দাসী-নাতনী এদের নিয়েই কেটেছে তার জীবন। সাওতাল পরগণা থেকে ফিরে বুড়ো বটের কোলে জনাব ফিরে গেছে। আস্তানা গেড়েছে পাতায় গড়া প্রকৃতির ইমারতের কাছে।

ইমারতকারের সমগ্র জীবন ব্যাপি চলতে থাকা সংঘাত সংঘর্ষে ইমারতকারের জীবনবেদ্য নাট্য ক্রিয়াতে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন বটগাছ তার বহুবল্লভিত বিস্তৃতি নিয়ে প্রকৃতি মাতারূপেই ইমারতকারকে কোলে টেনে নিয়েছে। এই ভাবে বৃষ্টি ভেজা জলের ঝাপটায় স্বপ্নের কুহেলিকা ছাপিয়ে ইমারতকার আপন সৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতির সৃষ্ট ইমারতের তুলনা করে জীবনের দুঃখ-যন্ত্রনাকে ভুলতে চেয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় চরিত্র —

> বারিক মন্ডল → পুত্রহারা → ভূমিহারা হয়েও → সাধন সমর গেয়ে চলে। আর জনাব খাঁ → স্বপ্ন দেখে → সফল ইমারতকারে পরিণত → ভিটেমাটি উৎখাত → বুড়োবটের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ।

গল্পের এই পরিণতিই নাট্যগতির সূত্রতাকে প্রমাণ করে দেয়। গতিময়তারত দিক থেকে নয়, পরিণতিতে যে ব্যঞ্জনা ময়তার মাদকতা ছড়িয়ে পরেছে তাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কারণ ছোটগল্পের ব্যঞ্জনাময়তা আমাদেরকে প্রতিমুহূর্তে চরিত্রের নাটকীয় ভাবরসের ঐক্য সূত্রকে প্রমাণ করে দেয়। সুতরাং এই গল্পদ্বয়ের ভাবরসের অন্তর্রহস্যের মূলে নাট্য ঘটনার যোগসূত্রতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের-ব্যঞ্জনাময়তা কাজ করেছে।

'একপো দুধ' গল্পের নাটকীয় চমৎকারিত্ব আরো বেশি। এরই সঙ্গে তুলনীয় 'সাদাঘোড়া'। দুই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং চরিত্রের ব্যঞ্জনাময়তা নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে গল্পদ্বয়ের মিল ও বিন্যাস রীতির দিকে নজর দিলে সূক্ষ্মভাবে দেখা যায় পূর্ণাঙ্গ জীবন ও জীবনের জটিলতা। তবে বলা চলে 'একপো দুধ'-এ দুধের অধিকার বোধ, এন্টালির ৭/৩/২ এর একতলা বাড়ির কোণ, পটলডাঙা স্ট্রীটে বীণাপাণী পাবলিশিং, বস্তির ফটিক এসব প্রকৃত পক্ষে আমাদেরকে চিনিয়ে দেয় আরো একটা অচেনা জগতকে। 'সাদাঘোড়া'য় এই পরিবেশ চিত্রন দাঙ্গার প্রেক্ষিতে হয়েছে ভয়াবহ। মেটিয়াবুরুজের স্মৃতিকথায় ভয়াবহতার স্মৃতিচিত্রন হাপ ধরিয়ে দেওয়ার মতই। গল্পের চরিত্ররা —

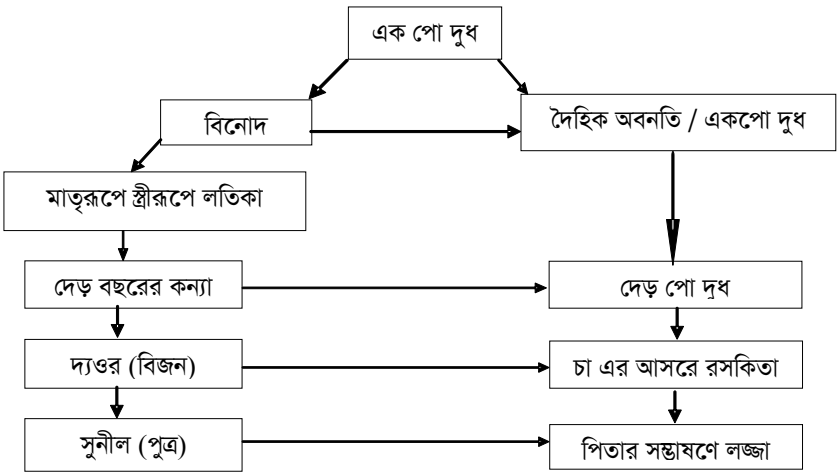

অভাবের সংসারে কিছুকাল বাদেই দুধের অধিকার নিয়ে ঝগড়া বাধে। বিনোদের দুধে ভাগ বসায় একে একে সকলেই। লতিকা নিজেও সে লোভ সামলাতে পারেনি। একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে নতুনত্বের স্বাদ পেতে চেয়েছে সে। তাই যথারীতি দুধ বেড়ালে চুড়ি করে খেয়ে গেছে এই গল্প শোনায়। ক্রমশ বাদানুবাদে এই পরিবেশ অন্ধকারের 'কালিমায় লিপ্ত হতে থাকে'। পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ভোরের আলোয় সমস্ত অভিমান মুছে গিয়ে চেনা-জানা ছন্দেই ফিরে আসে ৭/৩/২-এর একতলা বাড়ির গৃহ কোণ। তবে এবারের ছবিটি অন্য। এক পো দুধ নিয়ে এবারে নাট্যমঞ্চে দেখা গেল বধুটিকে ঠাকুপোর সামনে। কিন্তু বিনয় লজ্জায় আরষ্ঠ হয়ে ওঠে। অবশেষে না পেরে কাপটি হাতে তুলে নেয়। সুনীল-মা-বা ও কাকার মধ্যে এই দৃশ্য দেখে নিজের পড়ার প্রতি মনযোগ দেয়। আর বিজন সেই কাপটি সুনীলের হাতে দিলে, সুনীল তার বন্ধু ফটিককে তা দেয়। অর্থাৎ গল্পের দ্বিতীয় পর্বের ঘটনাক্রম নাট্যাবেশে আরো বেশি জমাটপূর্ণ হয়েছে। দুধের অধিকারী হয়েছে যারা—

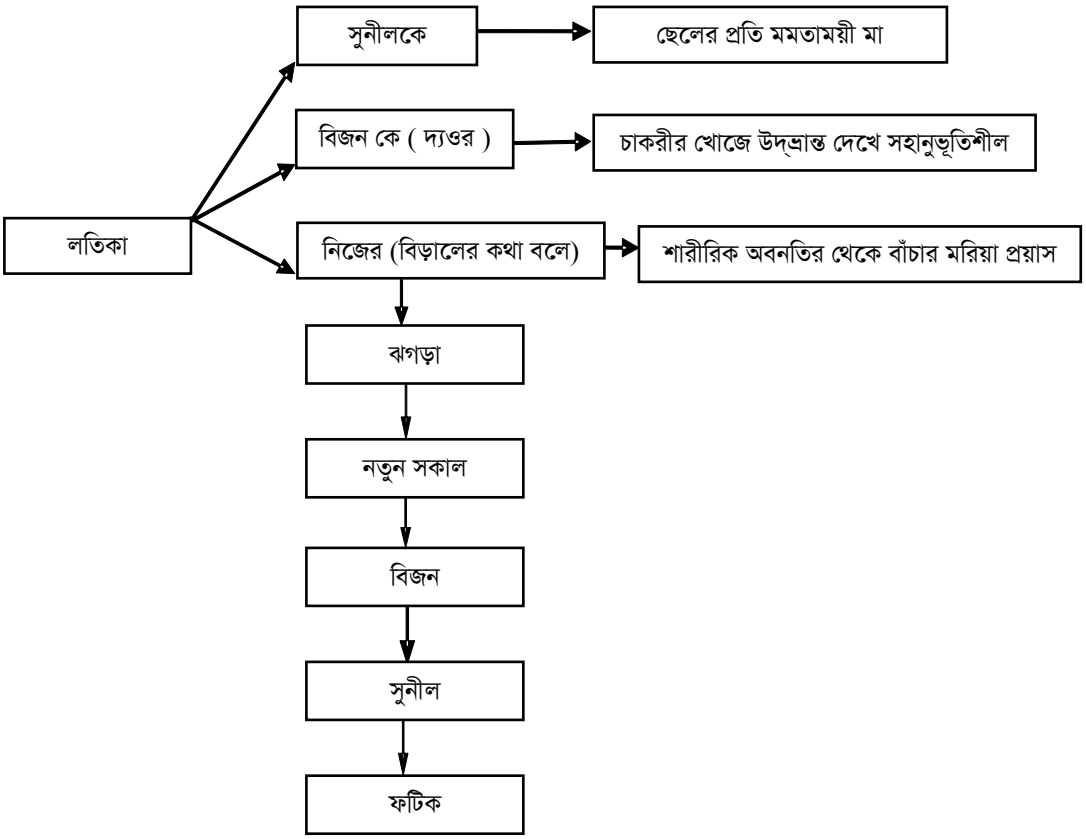

অর্থাৎ লতিকার মধ্যে স্ত্রী-মাতৃ রূপের সহবস্থানে একপো দুধের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই স্বামী, পুত্র দ্যওর এবং নিজের অধিকার বোধের কথা বলেছে এবং অধিকার পেতে চেয়েছে। চেয়েছে স্বামী-পুত্র, কন্যা আর সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকতে। নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক সুরাহা-সুব্যবস্থা না থাকলেও 'একপো দুধ' কিন্তু সকলের শারীরিক শক্তির শ্রীবৃদ্ধির প্রধান সম্বল হয়েছে। লেখক ৭/৩/২ গলির গৃহপরিবারের পাশাপাশি যখন পাশ্ববর্তী বস্তির কথা বলেন তখন এই বৈপরীত্যতার ছবি-সংগ্রাম যে আরো কঠিন তা প্রমাণ করে দেয়। বিনোদ-লতিকার থেকেও যে আরো করুণ পরিণতির ছবি এ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তারই ব্যঞ্জনাবহরূপ ফটিকের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

নাটকীয় ভাবনার সঙ্গে উক্তি প্রত্যুক্তিতে, ঘটনার মেল বন্ধন, চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতা, উত্থান-পতন সবই গল্পটিকে নাট্যগুনান্বিত করেছে। বিশেষত ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারে গল্পকার দেখিয়েছেন চরিত্রের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। উক্তি প্রত্যুক্তিতে ভরা এমনই কিছু নিদর্শন নিম্নে দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা হল —

ক। 'কি বউদি, চা-টা হয়ে গেল নাকি তোমাদের?' (বিজন)
খ। 'না, ভাই, তোমাকে ফেলে কি চা আমরা খাই, যে আজ খাব?' (লতিকা)
গ। 'চা নয় বিজু, দুধ খেলাম এক কাপ।' (বিনোদ)
ঘ। "ও তাই বল, চুরি করে দাদাকে খাওয়ানো হচ্ছে?' (বিজন)

এইভাবেই নাট্যভাবনার সূত্রতা খুঁজে পাওয়া যায়।

'সাদা ঘোড়া' ছোট গল্পটির বিষয় ভাবনায় অস্থির দাঙ্গার প্রেক্ষাপটকে প্রয়োগ করেছেন গল্পকার। 'সাদা ঘোড়া' মানবের প্রতিমূর্তি স্বরূপ যেন মানবেতর প্রাণ। ঘোড়ার গতি এখানে জীবন নাট্যের পরিণতিতে ও ব্যঞ্জনময়তায় পূর্ণতা পেয়েছে।

হিন্দু-মুসলিমের সংস্কৃতির মিলন সুর এগল্পে এসেছে সাধা ঘোড়াকে কেন্দ্র করে। গল্পের সূচনাতেই উল্লেখ করেছেন লেখক— 'দাঙ্গার সময়ের একটি ঘটনা'। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা শহর। পাশাপাশি অবস্থিত দুই পল্লি। পরিস্থিতি ও উত্তেজনা কমে এলে সহিসহীন একটি সাদা ঘোড়াকে একাকী ঘুড়তে দেখা যায়। তাকে ঘিরে ধরে একদল তরুণ যুবক। নিস্তব্ধ প্রাণহীন পল্লিতে ঘোড়াটিকে নিয়ে মুখরিত হয়ে ওঠে পাড়াটি। গল্পকার এখানেই Flashback পদ্ধতির মাধ্যমে যেন নাট্য মুহূর্তের সৃষ্টি করলেন। প্রথমে —

ছেলের দল → ছোটরা খুশি হল → বড়োরাও খুশি হল।

অর্থাৎ ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সংলাপের জন্য গল্পকার সৃষ্টি করেছেন গল্পটিকে। ঘোড়াটিকে কেন্দ্র করে নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তি চলতে থাকে— "কোন রাজার কিংবা জমিদারের ঘোড়া হইবে"। এরপর নানা গুঞ্জন শোনা যায়— "বড়োলোকের ঘোড়া কী খায়, কতটা পরিমাণ খায়"। বালক দলের নন্তের কথাতে "মদ না খেলে এত তেজি হয়?" এমন উক্তিতে ঘটনার comic relief মুক্ত হয়েছে। তবে ছেলের দলের মধ্যে যমুনা প্রসাদ ডাকাবুকো সর্দার যে দাঙ্গার দিনেও সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি করে, আবার গোরা সৈন্যদের সঙ্গে গল্প করে— সে 'মিলিটারি টি ক্যাপটেন' নামে পরিচিত। সুতরাং, গল্পের বুননীশক্তিতে রয়েছে নাট্যভাবেরই সুর।

ভাষা ব্যবহারেও গল্পকার মুখের ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আটপৌরে জনমুখের ভাষার প্রয়োগের প্রাণশক্তি দিয়েছেন—

> "শালা, ভেড়িকা বাচ্চা। শালা দু-কান বাঁচিয়ে ছিলাম। জুয়াসে ভি কত পয়সা নাফা করল। অভি পানকে ওয়াস্তে দোগ পয়সা মাংছে।"

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ নামের ঘোড়া। সাদা রঙের ঘোড়ার দেহের বর্ণনা ও চাঁদের সৌন্দর্যময় কমনীয়তার সুর একই সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার দরুণ গল্প নামের সঙ্গে সাদা ঘোড়া প্রাধান্য পেয়েছে। ঘোড়াকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মিলন ঐক্যের সুর সৌম্যরূপের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। গল্প নামের চূড়ান্ত পরিণতিতে সাদা ঘোড়ার মৃত্যু ও মানবের মিলন ঐক্যের সুর চিরকালের বন্ধনে পরিণত হয়েছে। সাদা ঘোড়ার পায়ের ঘা, অসুস্থতা, ক্রমে খাওয়া বন্ধ হওয়া যেন ইঙ্গিতায়িত দুই সমাজেরই গভীরতর ক্ষত। তাই দাঙ্গা থিতু হয়ে এলেও মুসলমান বৃদ্ধ সহিসকে নিয়ে উত্তেজনা আবার ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ার ছেলের দল, মিলিটারি, গুলির আওয়াজে, পরিবেশ আবার থম থমে হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির বলি হয় সাদা ঘোড়া।

গল্পটি সাদামাটা হলেও গল্প সূচনাতেই দাঙ্গার অস্থির চিত্র গল্পকার বর্ণনা করেছেন। এবং প্রথম থেকেই বর্ণনাভঙ্গীমায় একটা গতিময়তার ঐক্য সুরকে তিনি গ্রথিত করে দিয়েছেন। এইভাবে—

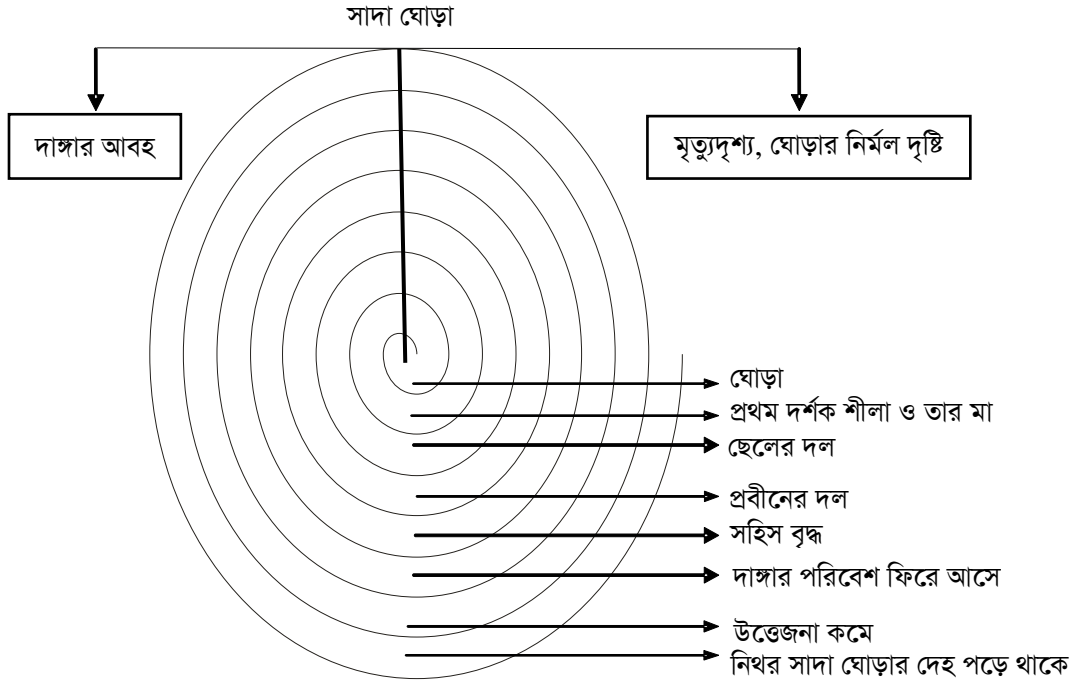

এই ভাবনায় ও পরিবেশের বর্ণনায় মানবপ্রীতি-প্রেমের জয়গানই যেন গাইতে চেয়েছেন গল্পকার।

ছোটগল্প নাট্যভাবের সূক্ষতম যে মিল তাই গল্পকাররা বলেছেন এবং তা পেয়েছি। ছোটগল্পের ব্যঞ্জনাশক্তি যতটা প্রসারিত হয়েছে ততটাই নাট্যগুনান্বিত বৈশিষ্ট্যের সুর খুঁজে পাওয়া গেছে। ছোটগল্পের নামকরণ, চরিত্র-প্রেক্ষাপটের একমুখীনতা ও নাট্যভাবকে মূর্ত করে তুলেছে। এই সকল গল্পে নাট্য ক্রিয়া, নাট্যগতি, climax ও পরিণতিই গল্পগুলিকে নাট্য স্তরে নিয়ে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, একশ এক গল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিঃ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৪১০।
২। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাদাস সম্পাদনা, বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র, প্রথম শুভম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১।
৩। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা – ২০০৯।
৪। দাঙ্গার গল্প দাঙ্গার বিরুদ্ধে, সম্পাদনা, বিজিত ঘোষ, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ – ২০০৯।
৫। মিত্র নরেন্দ্রনাথ, গল্পমালা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা – ২০০৯।
৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (অখন্ড সংস্করণ), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৭।